‘টানাপোড়েন’ : এক শিল্পী-গোষ্ঠীর জীবন-বয়নের ভাষা

সব উপন্যাস না-হলেও, কোনও কোনও উপন্যাস পড়তে গিয়ে পাঠক বারবার তার ভাষার প্রতি মনোযোগী না হয়ে পারেন না। তবে এই মনোযোগ বিশেষভাবে কোনও শ্রেণি-চিহ্নিত উপন্যাসের ওপরই পড়ে, এরকমটা নয়। ‘অন্তর্জলি যাত্রা’, ‘শেষ-নমস্কার : শ্রীচরণেষু মাকে’, ‘হারবার্ট’—উল্লিখিত উপন্যাস তিনটির ভাষা আমাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু এদের ভাষারীতিতে পার্থক্য রয়েছে, বিষয়বস্তুতেও। ভাষারীতি একটি উপন্যাসের বিশেষ আকর্ষণের কারণ হলে আমরা কি উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে লেখা ছাড়িয়ে লেখকের প্রতি মনোযোগী হই না? ‘অন্যরকম’, অর্থাৎ যেরকম ভাষাতে আমরা উপন্যাস পড়তে সাধারণত অভ্যস্ত, তার থেকে পৃথক ভাষা মনে হলেই লেখকের অন্যান্য রচনার প্রতিও মনোনিবেশ করি। বুঝে নেবার চেষ্টা করি, ভাষারীতিতে তাঁর নিজস্বতা। কিন্তু এ তো গেল একদিক। আমরা উপন্যাসটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলিয়েও কি উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষার পাঠ নিই না? সাহিত্যের ভাষা যে বিষয়-নির্ভর, এ-কথা আজকে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আসলে উপন্যাসের ভাষারীতি মধ্যেও সাহিত্যের অন্যান্য উপাদানের মতোই বহুমাত্রিকতা বর্তমান। বহুকৌণিক পর্যবেক্ষণেই বিচ্ছুরিত হতে পারে একটি উপন্যাসের ভাষা-বর্ণালি।

দুই.

সমরেশ বসুর ‘টানাপোড়েন’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৭-তে। উপন্যাসটি পাঠকমহলে বেশ পরিচিত। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের বালুচরী শিল্প, শিল্পরচনার পিছনে শিল্পীর সৃজনদক্ষতার সঙ্গে যে কান্না-ঘাম-রক্ত-দীর্ঘশ্বাস মিশেছে, তারই শিল্পরূপ দেওয়া হয়েছে এখানে। সমরেশ বসু ‘গঙ্গা’ উপন্যাসে মাছমারাদের

জীবনকাহিনি উপহার দিয়েছিলেন। সেখানে জীবিকাশ্রয়ী অঞ্চলকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনাতে তাঁর দক্ষতা ধরা পড়েছিল। কিন্তু 'গঙ্গা' আর 'টানাপোড়েন' একজাতীয় জীবিকার পরিচয় বহন করে না, এক অঞ্চলেরও। তারাশঙ্করের নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের ভৌগোলিক পটভূমিটি পাঠকের যেমন মানসপটে ভেসে ওঠে, সমরেশ বসুর ক্ষেত্রে এরকম নির্দিষ্ট কোনও পটভূমি পাঠকমনে নির্ধারিত হয়ে থাকে না। রাঢ় অঞ্চলের প্রতি তারাশঙ্করের সহজাত অধিকার, উত্তরাধিকারও বটে। কিন্তু সমরেশ বসুর ক্ষেত্রে পটভূমি নির্মাণে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরকে নির্বাচন সহজাত নয়, উত্তরাধিকার তো নয়ই, অর্জিত-অধিকার। অধিকারের এই ভিন্নতা অবশ্য শিল্প-সাফল্যের পরিমাপক নয়। কিন্তু যে উপন্যাসের বিষয় ও পটভূমি অঞ্চল-পরিচয় স্পষ্ট মাত্রায় প্রকাশ পাবার দাবি রাখে, সেখানে লেখক যদি 'বহিরাগত' থেকে যান, ভাষা-নির্মিত অবয়বে তা ধরা পড়ে, তখন সেই উপন্যাসে প্রযুক্ত ভাষারীতিও প্রশ্নচিহ্নর মুখে পড়ে। 'টানাপোড়েন' উপন্যাসটি আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা স্মরণে রাখব সে-কথাও।

সমরেশ বসু উপন্যাসটির ভূমিকাতে জানিয়েছেন, 'আমি চেষ্টা করেছি, বিষ্ণুপুরের তাঁতশিল্পীদের জীবনযাপনের ছবি, মুখের ভাষা, ধ্যান-ধারণাকে রূপ দিতে।' এখানে 'মুখের ভাষা' শব্দ-বন্ধটি লক্ষ করা যেতে পারে। 'মুখের ভাষা' উপন্যাসে ব্যবহারের প্রধান জায়গা হল চরিত্রের সংলাপ। উপন্যাসের ভাষা-নির্মিত অবয়বকে প্রাথমিকভাবে আমরা ভাগও করি সাধারণত দুটি অংশে, যার একটি বিবৃতি, অন্যটি সংলাপ। উপন্যাসে শিল্প-সংরূপটির প্রয়োজনীয়তার দাবি মেনেই সংলাপকে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে হয়। আর সেই সংলাপে ব্যবহৃত হয় 'মুখের ভাষা'। কিন্তু 'টানাপোড়েন' উপন্যাসের সংলাপে 'মুখের ভাষা' ব্যবহার আরও তাৎপর্যময়। লেখক যে অঞ্চলের মানুষের কথা বলেছেন, যে সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন সংলাপ সৃষ্টিতে তার দিকে নজর দিতে হয়েছে। তাছাড়া নিশ্চিতভাবেই সংলাপে 'মুখের ভাষা' সংযোজনের ক্ষেত্রে মনোযোগী হতে হয়েছে চরিত্রের লিঙ্গ, কথোপকথনে অংশগ্রহণকারী চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক, বয়স, পরিস্থিতির প্রতি। মানুষের মুখের ভাষা এগুলির উপরও নির্ভরশীল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উত্থাপন করে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

পুকুরঘাটে ক্রুদ্ধ টুকির মোতির উদ্দেশে সংলাপ—

ক. "পলাচ্ছু ক্যানে ছিনাল মাগী। ঘাটে নাঙিন করতে এয়েচু? যা যা, পঁদে নাই ছাল চামড়া / লাচতে যাইচে খাটরাপাড়ায়।" (পৃ.৬৫)

খ. "এক মাঘে জাড় যায় নাই গ খটখটি তাঁতীর মাড় খাউনি মাগ। হাররায় লাড়া খাওয়া করাব তোকে...।" (পৃ.৬৬)

এই টুকিরই আবার সংলাপ পাল্টে যায় প্রেমের প্রকাশে—"আমি দেখাইতে লারছি গ, আমার ভিতর থেক্যা কে তোমাকে রাতদিন ডাকা করচ্যে। কবে তোমাকে দেখলাম, কবে এমন হল্য, জানি নাই গ লসকাদার। আমি তুকতাক জানি নাই। তুমি ঘরের দুয়ার দিয়া গেল্যে, আনখা আমার মন লাড়ি খেয়্যা যায়, আমার আগর খুল্যে যায়গা, তুমি যে-বাগে যাও, উ বাগে ছুটি।" (পৃ. ১৯০)

গুরু-শিষ্যের শিল্পকেন্দ্রিক ভাবনার আদান-প্রদানের সংলাপ আবার অন্যরকম। দুজনের সংলাপেই অলংকার বহুলতা নেই, আছে আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার-মুক্ত (ক্রিয়াপদ নয়) সর্বজনীন আবেদনে যৌথ স্বপ্ন-বয়নের আয়োজন।

"তারপর জিজ্ঞেস করলে, 'জমির লসকার রঙ কিছু ভেবেচু?' পাঁচুর গায়ের ঘাম এখন ঠাণ্ডায় জড়াচ্ছে। বললো, 'আঁজ্ঞা জাম রঙের জমিন—।' 'না।' ওস্তাদ মাথা নাড়লো, বাঁধের মাঝখানেকের জলের যেমন রঙ জমিনটা সেই রঙ হবেক।' পাঁচু বললো, 'তবে উটিই হবে আঁজ্ঞা। লসকা হবেক আমাদিগের বিষ্ণুপুরের লাল মাটি রঙ, আর উয়ার সঙ্গে মেজেণ্টা।'

ওস্তাদ অন্য জানালায় আতা গাছের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলো তারপর আবার পাঁচুর কাঁধে হাত রেখে বললো, 'হুঁ হুঁ, উটি খুলবেক। মাটির রঙটা বিষ্টির জলে ভিজা রঙ করিস।' " (পৃ. ১১৩)

পাঁচুর 'ছোট ঠাউরদা'র ভাষার মধ্যেও স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। পাঁচুর বন্ধুস্থানীয় 'ভিক্ষা-ভাই'। উচ্চবর্ণের মানুষ হওয়ার জন্য আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগে শিষ্টতা আছে এমন নয়, কিন্তু তার কথনধর্মে এক ধরনের দাপট আছে। কেবল বন্ধু হওয়ার কারণে নয়, যেন জ্ঞান-বুদ্ধি জীবন-অভিজ্ঞতায় সে-যে পাঁচুর থেকে ওপরে অবস্থান করে এটি বোঝানোর চেষ্টা আছে এর মধ্যে। 'ছোট ঠাউর'-এর সংলাপ—"যোগেন ঘরকে থাকলে দুঃশাসনের বুক ফালা কর্যে রক্ত খেত্য। তু আজ ফিরে যেত্যে পারতিস নাই। আর বাঁজা ঠমকী মাগী আমাকে সাক্ষী রেখ্যে ভাতারের শত্তুরকে পেসাদ খেত্যে ডাকা করচে? তু শালা বামনাকে জপ শিখা করাইচু র‍্যা?" (পৃ. ১২৩)

'মুখের ভাষা'কে ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখকের আন্তরিকতা ধরা পড়ে ঈশ্বরদাস চরিত্রটির সংলাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও। ঈশ্বরদাস রেশম খাদি ভবনের কর্তা-ব্যক্তি। বিষ্ণুপুরে বসবাস করলেও আসলে সে বহিরাগত। আবার ব্যবসার কারণে বহির্জগতের সঙ্গেও তার যোগাযোগ রয়েছে, এই জন্যই 'ঈশ্বরদাসের বাংলা কথায় পুবা ধরন'। ঈশ্বরদাসের সংলাপ—"বলছেন? আমার কিন্তু পাঁচুর তাজমহলের নকশাটাই বেশি ভাল লেগেছিল। ওটার এখনো চাহিদা আছে। তবে, এটাও দেখা যাক কেমন হয়। কিন্তু আসলে কী হয়েছে জানেন অভয়বাবু, আজকালকার লোক এত টাকা দামের শাড়ি কাপড় কিনতে চায় না। শাড়ির দাম শুনলেই সব ভেগে

পড়ে। সবাই সস্তা জিনিস চায়।" (পৃ.১৭৫-১৭৬)

সাহিত্যের অন্তর্গত শিল্পিত মানুষ অর্থাৎ চরিত্র মুখরিত হতে পারে সংলাপের পাশাপাশি গানেও। এখানে, ভাষার আলোচনাতে গান ব্যবহারের তাৎপর্য সন্ধান আমরা করব না, কিন্তু গানের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত মুখের ভাষার প্রতি নজর দেব। পাঁচু হালকা চালে ছড়াগান পরিবেশন করে স্কুল-পড়ুয়া ছেলেকে তাঁতের কাজে লাগাতে। এইজন্য সামান্য বদলও করে নেয় ছড়া-গানটি। 'ভুজনি জোড়' শব্দটি জুড়ে দেয়। '—অ তাঁতী ভুজনি জোড় বুন্ বুন্ / তাঁতী কৃষ্ট কথা শুন।' (পৃ.৩৭) পাঁচুর বাবা জগত কীতের গীতটি তসরগুটির রূপকে তাঁতির জীবনভাবনা-প্রকাশক। জগত কীতের গাওয়া গানটি এরকম—'ঘর বাঁধা করচি আমি / তুঁত গাছে আর শাল গাছে। / উ-ঘরের ভিতরে মরণ আমার / দ্যাখ ক্যানে, তালাই বেঁন্ধে লিয়া যাইচে।' (পৃ.১৩৬) পাঁচু আর যোগেনের লড়াইও গান হয়ে মুখে মুখে ফেরে,— 'বাউরিপাড়ায় দেখ্যে এলাম/কাড়া লড়াই লেগ্যেচ্যে, লাগে দুই শিং পড়্যেচে/রক্তে বান বয়েচে।' (পৃ. ২১৬) মোতির মুখেও দুটি ছড়া-গান সংযোজন করেছেন লেখক। দুটিতেই দাম্পত্যজীবনের শূন্যতা, বেদনাবোধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটি হল,— 'যমুনা বাঁধে নাইতে গেলাম, / ই বাগ উ বাগ ঘুর‍্যা এলম / কাঁধের গামছা কাঁধকে রইল / নিংড়াতে গ পেলাম নাই। / মনে বড় আশা ছিল / আশা মিটল নাই।...' (পৃ.-২০৫)। দ্বিতীয়টি,—'আম গাছকে আম নাই / য্যাতই ফাবড় মার হে / তোমার দেশের আমি লই / য্যাতই চখ ঠার হে।' (পৃ. ২০৬)

তিন.

দেখা যাচ্ছে, ঔপন্যাসিকের ভাষা-শিল্পটির সমগ্র পরিসরের অনেকখানি দখল নিয়েছে 'মুখের ভাষা'। গান ও সংলাপ অংশে প্রতিষ্ঠা করেছে তার অধিকার। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে যে বিবৃতি অংশ বা বয়ান অংশ তাতে সাধারণত ঔপন্যাসিকেরই একাধিপত্য থাকে। আমরা যখন কোনও ঔপন্যাসিকের ভাষারীতির পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে চাই তখন বিশেষত এই বয়ান অংশটিই গ্রহণ করে থাকি। সেই বয়ান অংশটিতেও এই উপন্যাসে 'মুখের ভাষা'র অধিকার-বিস্তার লক্ষ করার মতো। বিবৃতি বা বয়ান ভাষারীতির যেন ভিন্ন আদল দিতে চেয়েছেন লেখক। আমরা তারও বিস্তৃত পরিচয় নেব।

উপন্যাসের মধ্যে ঔপন্যাসিক বাস্তবজীবনের যে প্রতীতি তৈরি করতে চান তার জন্য অতি অবশ্যই প্রত্যক্ষ জগৎকে অবলম্বন করতে হয়। বয়ান-অংশের অনেকখানি জুড়ে থাকে এই দৃষ্ট জগৎ। আমরা বয়ান অংশে ব্যবহৃত এই জগৎটিকে বলতে চাইছি—'প্রত্যক্ষ বিশ্ব'।

আবার বয়ান অংশেই উপন্যাস-অন্তর্ভুক্ত চরিত্রের দুঃখ ও ক্রোধ, ভালোলাগা ও মন্দলাগা, ভাবনা ও গতিবিধিকে অনেকাংশে প্রকাশ করতে হয়। কারণ সংলাপের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক চরিত্রের সামগ্রিক পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে পারেন না। বয়ান অংশের মধ্যে যেখানে চরিত্রের মানসলোক উদ্‌ঘাটিত হয় তাকে বলা যেতে পারে 'চেতন-বিশ্ব'।

তবে উপন্যাসের শরীর তো নির্মিত হয় শব্দ দিয়ে। ফলে 'প্রত্যক্ষ-বিশ্ব' বা 'চেতন-বিশ্ব' যা-ই বলে চিহ্নিত করি না কেন, শেষ পর্যন্ত তাকে করে তুলতে হয় 'কথন-বিশ্ব'-এর সামগ্রী। আর এই 'কথন-বিশ্ব'-এর সামগ্রী করে তোলার মধ্যেই রয়েছে ঔপন্যাসিকের শিল্প-কুশলতা। পাঠক এই 'কথন-বিশ্ব'-এর মধ্য দিয়ে স্পর্শ করতে চান 'প্রত্যক্ষ-বিশ্ব' ও 'চেতন-বিশ্ব'কে।

'প্রত্যক্ষ-বিশ্ব'-কে রূপ দেওয়ার জন্য লেখক ব্যবহার করেছেন বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের মানুষজনের মুখের ভাষা। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিতে পারি—

ক. 'মামা ভাত খাওয়া, যাকে বলে অন্নপ্রাশন। লয় তো বলো ভুজনা।' (পৃ. ৬৮)

খ. 'কঁচড়া বলো, আর মহুয়ার বীজ বলো, এক বস্তু।' (পৃ.১৪৩)

গ. 'পাঁচু লাফিয়ে লাফিয়ে হিঞ্চেগোড়ার ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে পচি বাগে ছুটলো।' (পৃ. ১৪১)

ঘ. 'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ডগায় ফটনপেনের লিবটি লেবড়ে দিয়ে ছাপ দিয়া তুলা করে লিবেক।' (পৃ.১৪০)

ঙ. 'ঘুগি না অঁড়কক, বুঝা দায়।' (পৃ.৭৭)

চ. 'সে দেখলো যমুনার মাঝখানে টেসকনাটা জলের মধ্যে টুপুস করে ডুব দিল। যাকে বলে মাছরাঙা।' (পৃ.৫৯)

লেখক একটি অঞ্চলের যে-মানুষজনের জীবন-পরিচয় দিয়েছেন তারা বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ, বিশেষ একধরনের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। ফলে সেই জীবন-জীবিকার পরিচয় দিতে গিয়ে 'প্রত্যক্ষ-বিশ্ব'-এ ঢুকে পড়ল শিল্পী-সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত শিল্পকেন্দ্রিক ভাষা। দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে—

ক. 'খাচান দড়ি, জালি পাটা, ছুচ মৌরি, জেকার্ড মেসিনের সঙ্গে এই তিনে মিলে প্রথম বন্ধন বালুচরীর।' (পৃ. ১৩)

খ. 'পারডোব হলো, তাঁতীর পা ডুবিয়ে বসার চৌবাচ্চার মতো ঘর কাটা গর্ত।' (পৃ. ১৬)

গ. 'ঢাল করা মানেই টানার লরাজে সুতো গোটানো। তাঁতীর তাঁতে বসার আগে, এইটি শেষ কাজ। টানার লরাজে থেকে কোল লরাজে, টানার বন্ধন। কোল লরাজে, যাকে বলে পেটের কাছে চেপে রাখা, মাকু ফাবড়িয়ে, দক্তি টেনে কাপড় গোটানো লরাজে। মাকু

ফাবড়ানো মানেই ভরনা। ভরনা হলেই পোরা, কিন্তু কথায় বলে টানা পোড়েন।' (পৃ. ২০-২১)

'প্রত্যক্ষ-বিশ্ব'-এ ব্যবহারিক জগতকে তুলে ধরতে হয়। ব্যবহারিক জীবনের ভাষা জায়গা পেল বয়ান-অংশে। এরকম স্বাভাবিক অনুপ্রবেশ হিসাবে 'মুখের ভাষা'র প্রয়োগকে যৌক্তিক মাত্রা দেওয়া যায়। লেখক অন্তত এরকমভাবে ভাববার অবকাশ রেখেছেন। কিন্তু 'চেতন-বিশ্ব'-এর ভাষা?

'চেতন-বিশ্ব' বলতে কী বুঝি, তা আমরা জানিয়েছি। একটি চরিত্র যখন কথা বলে তখন তা লেখকের ভাষা হয়েও চরিত্রের ভাষা। লেখককে প্রায় ক্ষেত্রেই বিশ্বস্ত থাকতে হয় মানুষজনের ব্যবহার্য ভাষার প্রতি। যখন লেখক সেই চরিত্রটির মনোজগতকে রূপায়ণ করবেন তখন সেই ভাষা একদিক থেকে পরিপূর্ণভাবে লেখকের ভাষা। সমরেশ বসু এই উপন্যাসে মনোজগতকে রূপায়ণেও 'মুখের ভাষা'-কে জায়গা করে দিয়েছেন। মনোজগতের রূপায়ণে প্রযুক্ত ভাষাকে বলতে পারি চরিত্রের 'চিন্তনের ভাষা'। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

ক. মোতির 'চিন্তনের ভাষা'—'আকাশে ক্যানে বৃষ্টি নাই, জমিতে ক্যানে জল নাই, সংসার ক্যানে খরায় ফাটে, উসব কেউ বুঝতে পারে? অই করে, চার বছরের মুখে নোটো পেটে এসেছিল। খুড়া শাশুড়ী বলতো যার যেমন আঁনজা।' (পৃ.৫১)

খ. পুনির 'চিন্তনের ভাষা'—'না, লালবাঁধকে ক্যানে, পুনি কোথাও যাবেক নাই। সাঁঝবেলায় ক্যানে? দিনেমানেও কোথা যাবেক নাই। হুঁ, অজাদার পায়ের শব্দের লেগে পুনির কান খাড়া হয়ে থাকে। হুঁ, উয়ার চোখের দিকে তাকালে, বুকে মীনার নকশা ফোটে।' (পৃ.৮১)

গ. পাঁচুর 'চিন্তনের ভাষা'—'তিনদিন ধরে সে খালি মনে মনে বলছে, কাটরা মেমায়, না ছাগল মেমায়? একজন কেউ আর একজনকে নিশ্চয়ই ডাকছে। কিন্তু পাঁচু যে লসকাদার। তার চাষের মাঠখানি আকাশবাগে মুখ করে আছে। মেঘ ডাকে না, বৃষ্টি নামে না। তার মন খারাপের কথা তোমরা বুঝ নাই গ, বুঝ নাই।'

চরিত্রের 'চিন্তনের ভাষা' যেমন হল মুখের কাছাকছি, তেমনি লেখকের চরিত্র-চিত্রণের ভাষাটিও এ ব্যাপারে লক্ষণীয়। লেখক বালুচরী শিল্পীদের জীবনকথা বলছেন বলেই চরিত্র-চিত্রণের ভাষাতেও ঢুকে গেল বিষ্ণুপুরের বালুচরী শিল্পেরই অনুষঙ্গ। উদাহরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে কয়েকটি—

ক. 'জগতের খালি গা, পুরনো কালো ফিতা পাড় কোঁচকানো তসরের মতো গা। পুরনো হলেও, খাঁটি তসরে যেমন একটা জেল্লা থাকে তার বুড়ো রেখায় সেরকম জেল্লা।' (পৃ.২)

খ. 'বাপের মতো গড়ন পেয়েছে, মুখ পেয়েছে, গায়ের রঙ কাঁচা রেশমের মতো। উটি মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে। সিজিয়ে কাবাই করা রেশমের মতো না। কাঁচা রেশম, প্রথম কাটানির সময়ে যেমন হয়, জেল্লা নেই, রঙ চাপা তেমনি।' (পৃ. ২৩)

গ. 'মোতি তার বিটির থেকেও, এক ছোট নলির মতো খাটো হবে। পলু-যাকে বলে রেশমগুটি সিদ্ধ করে তার গা থেকে প্রথম ছাড়ানো সুতোর মতো রঙ। নকশার গলানি মাকুর মতো টানা চোখ, দুই তারা যেন মীনা করা ঝিলিক দেওয়া রেশম।' (পৃ. ৫৭)

এই উপন্যাসের কথন-প্রক্রিয়াও বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। প্রথম পুরুষের জবানিতে, কখনও উত্তম পুরুষের জবানিতে উপন্যাসের কাহিনি-কথনের যে চেনা রীতি, তার থেকে স্বভাবধর্মে পৃথক 'টানাপোড়েন' উপন্যাসটি। পাঁচু কীত বা উপন্যাসের অন্য কোনও চরিত্রকে কথক হিসাবে উপস্থাপিত করে লেখক সহজেই বিবৃতি অংশে 'মুখের ভাষা'র জায়গা করে দিতে পারতেন। লেখক এই সহজ রাস্তাটি নেননি। লেখক প্রথম পুরুষের জবানিতেই উপন্যাসের রূপ দেন, অথচ কথনশৈলী পরিপূর্ণভাবে 'মুখের ভাষা' আশ্রয়ী। লেখক বিষ্ণুপুর অঞ্চলের মানুষজনের বাগ্‌ভঙ্গি গ্রহণ করে, লৌকিক কাহিনি-কথনের রীতি আত্মসাৎ করে, তাঁত-শিল্পীদের জীবনযাপন ও শিল্পসৃষ্টিকে তুলে ধরেছেন তাঁত-শিল্পীদের একজন হয়েই। বয়ান অংশের প্রায় অনুচ্ছেদই লেখক শুরু করেছেন হঁ, অই, তবে, ইয়া ইত্যাদি শব্দ দিয়ে। যেমন—

১. হঁ, তুমি সেবা মণ্ডলের পাটরাঙা না নিতে পারো।
২. অই অই, আহা, এত পাছুড়া দিয়ে পড়লে কী হবে।
৩. তবে ইয়া পাট দিলাম রঙ দিলাম তারপর যদি আদায় না হয়?

লৌকিক কাহিনি-কথনের রীতি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যেমন—"কিন্তু অই হে, ই ভেব নাই কি যে বিষ্টুপুরের তাঁতীর ঘরে, তিনশো বছরের বাদশাহী আমলের ভূত তাঁতে জড়িয়ে আছে। ইয়ার জাত গোষ্ঠি কোষ্টি নাড়ি নক্ষত্র মিলিয়ে দেখ, তুমাদিগের ভোট কাড়ানি সরকারের দেশে, বাদশাহী আমল কেমন ঝলক দিচ্ছে।" (পৃ. ১৪)

এই প্রবন্ধের শুরুর দিকে বলেছিলাম যে লেখক অনেকসময় অঞ্চলকেন্দ্রিক উপন্যাসে 'বহিরাগত' থেকে যান। কিন্তু এই উপন্যাসের কথনরীতি দিয়েছে অন্য তাৎপর্য। উপন্যাসটিতে বাইরে থেকে দেখা এক বিশেষ অঞ্চলের জীবনযাপনকে লেখক প্রত্যক্ষ করাতে চাইছেন না, যেন লেখক এই শিল্পীসমাজেরই প্রতিনিধি হয়ে তাঁতশিল্পীদের জীবনকথাকে বাইরে প্রকাশ করছেন।

তাঁত-শিল্পীদের জীবন বয়নে তাদের 'মুখের ভাষা'কে উপন্যাসের শরীরে এতখানি জায়গা করে দেওয়ার ফলে উপন্যাসটির পাঠে কি কোনও প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে? কেননা, একথা মনে রাখতে হয়, এই উপন্যাস কোনও বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জন্য লিখিত নয়, এর লক্ষ্য সেই পাঠক, যাঁরা সর্বজন-মান্য বাংলাভাষা বোঝেন এবং সেই ভাষার সাহিত্যের রস-উপলব্ধি করতে পারেন। এই প্রশ্নের মীমাংসায় ভাষা-শিল্পী সমরেশ বসু আর বালুচরী-শিল্পী পাঁচু কীতের বয়ন-ভাবনার একটি সম্পর্ক-সূত্র তৈরি করতে পারি।

পাঁচু কীত, নকশাদার পাঁচু কীত এই উপন্যাসে নকশা বুনে চলে। প্রথমে তা বোনা হয় 'নকশাদারের ধ্যানে', তারপর কাগজে, অপেক্ষা চলে শাড়িতে বোনার, সুযোগ পায় না। কারণ ঈশ্বরদাস মঞ্জুর করে না। নকশাটি হল 'বেদা-বেদেনী'-র। এর আগে পাঁচু তাজমহলের নকশা বানিয়েছিল। তার প্রশংসাও করেছিল ঈশ্বরদাস। কেন না, তার বাজার হয়েছিল। কিন্তু তাজমহল কি পাঁচু অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি মিলিয়ে সৃষ্টি করতে পেরেছিল? আর 'বেদনা-বেদেনী'-র যে নকশা তা তো নিজের চোখে দেখা ঝাঁপান খেলার শিল্পরূপ। বালুচরী শাড়িতে পাঁচু কীতের এই নকশা তৈরি পরিকল্পনার মধ্যে আছে অন্যদিকও। শিল্পী তার অঞ্চলের শিল্পকর্মে সেই অঞ্চলের লোকঐতিহ্যকে এখানে জায়গা করে দিচ্ছে। গুরু অভয় খানের কথা 'বড় সোন্দর এঁকেচু র‍্যা পাঁচু'—পাঁচুর কানে বাজতে থাকে ঈশ্বরদাস-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পরেও। এই জন্যই তার সঙ্কল্প—'ই লসকার শাড়ি আমি বুনা করবক।' পাঁচু কীত বালুচরী শাড়ির কারিগর নয়, শিল্পী।

বালুচরী শিল্পী পাঁচু কীত যেমন লোক ঐতিহ্যকে, নিজস্ব অভিজ্ঞতা-উপলব্ধিকে বুনে দিতে চায় বালুচরী শাড়ির নকশায়, ঠিক একইভাবে ভাষা-শিল্পী সমরেশ বসু তাঁত-শিল্পীদের জীবনকে তাদের ভাষাতেই বুনে দিতে চান উপন্যাসের পাতায়।

উপন্যাসটির নাম 'টানাপোড়েন'। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ এর অর্থ জানিয়েছেন, 'কাপড়ের দৈঘ্যের ও বিস্তারের সুতা টানা পড়েন করা। গৌণার্থে আনাগোনা করা।' এই বারবার সুতোর আনাগোনাতেই শেষ পর্যন্ত ফুটে ওঠে বালুচরী শাড়ির নকশা। এই উপন্যাসের বয়ানের ভাষাতেও লক্ষ করব মান্য চলিত ভাষা এবং অঞ্চলের 'মুখের ভাষা'-র টানাপোড়েনে নির্মিত হয়েছে এক ভিন্ন ধরনের নকশা। বালুচরী শাড়ির নকশা বিষ্ণুপুরের তাঁত-শিল্পীদের সৃষ্টি, কিন্তু তা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে সর্বসাধারণের, তেমনি 'টানাপোড়েন' উপন্যাসটির ভাষার নকশা বিষ্ণুপুরি, কিন্তু তা অর্জন করেছে সাধারণ পাঠকের গ্রহণযোগ্যতা।

আলোচিত 'টানাপোড়েন' উপন্যাসটির উদ্ধৃতিগুলি ব্যবহার করা হয়েছে প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৩৯৪ থেকে। প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।